শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা মানুষের মুখ

সুমিতা চক্রবর্তী

রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে ছিল রবীন্দ্র জীবৎকালেই। আজ এত সম্পন্ন হয়ে উঠেছে সেই সম্ভার এত বৈচিত্র্যময়—যে গবেষণা হচ্ছে রবীন্দ্র-আলোচনার বিভিন্ন সৃষ্টিকোণ, পদ্ধতি ও প্রকরণ নিয়ে। পরবর্তী কবিদের মধ্যে বহু আলোচিত হবার অধিকার তাঁর জীবন দিয়ে, মৃত্যু দিয়ে এবং সর্বোপরি সৃষ্টিকর্ম দিয়ে অর্জন করে নিয়েছেন জীবনানন্দ। তাঁর সমকালীন অন্য কবিদের নিয়ে রচিত আলোচনা গ্রন্থ কারো কারো ক্ষেত্রে এখনও একটি বই দুটি হয়নি। এবং আর কারো ক্ষেত্রেই সম্ভবত মোট সংখ্যা দুই অঙ্কের ঘরেও গিয়ে পৌঁছয়নি। আরো পরের কবিদের ক্ষেত্রে হয়তো তার সময়ই আসেনি আজও।

অন্তত একজনের ক্ষেত্রে সেই সময় এল বড়ো নিষ্ঠুরভাবে, বড়ো আকস্মিক—প্রস্তুত ছিল না কারো মন। ঠিক এই সময়টিতে—যখন প্রতিদিনই নবীনতরভাবে উন্মোচিত হয়ে ওঠা এক কবিকে আপাত অর্থে নীরব করে দেয় এক অকালমৃত্যু—তখন বোধহয় কারো পক্ষে সম্ভবও নয় তাঁর কাব্যকর্ম নিয়ে কোনো বিশ্লেষণে বসা।

কিন্তু আমাকে যদি বলতেই হয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়-কে নিয়ে—তাহলে কবিতার কথাই আমাকে বলতে হবে। তাঁর সঙ্গে তেমন কোনো ব্যক্তিগত পরিচয় তো আমার ছিল না যার সাহায্যে লিখতে পারি কোনো স্মৃতিময় গদ্য। দেখা হয়েছে ক্বচিৎ—তিনটি কি চারটি কবিতা পাঠের সভায়। সেখানে তিনি আছেন মঞ্চে। আমি মঞ্চের বাইরে—নিতান্ত মাটিতে না হলেও পিছনের সারির চেয়ারে। যখন তিনি কবিতা পড়ে নেমে আসেন পাটাতন থেকে তখনও যেন তিনিই রাজা। অন্য কারো দিকে চোখ পড়ে না উপস্থিত শ্রোতা-দর্শকের। তাঁকে ঘিরে থাকেন তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুরাগীবৃন্দ। কখনো তাঁকে আড়াল করেন, কখনো উশ্‌কে দেন নির্দিষ্ট কোনো কারণ দেখা না দিলে খুব যে কাছে যেতে ইচ্ছে হয়েছে এমনও নয়। দূর থেকে দেখেছি ফিরে এসেছি বাড়িতে। ফিরে এসেছি কলকাতার পরিবাহী ভিড়ের মধ্যে লাট খেয়ে নিজের ঘরের প্রাত্যহিক স্বস্তিতে। পথে এবং ঘরে—সর্বত্রই মনের মধ্যে ফিরে ফিরে বেজেছে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—*মন-স্থাপন/হয়নি করা* ও *ঘর-ঘড়া, স্বপ্নে যেমন/মেঘ আসে আর বৃষ্টিতে হয় ছিষ্টি মুখর/আমার মধ্যে ভর করেছে এবং যাদুকর.../সেই আনন্দে/জীবন নামক জটিলতার হিসেবনিকেশ দুদিক বন্ধ/(আমার মধ্যে এক যাদুকর, হেমন্তের অরণ্যে আমি পোষ্টম্যান)*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন ওই বিশেষ কবিতাটিই মনে পড়ে তার নির্দিষ্ট কোনো কারণ পাই না। সকলেই জানেন—এক একদিন এরকম হয়। কোনো একটি গান বা কবিতার পঙ্‌ক্তি মনের মধ্যে গুনগুন করে যদিও এ সত্য অস্বীকার করা যায় না যে, নিজের মনের সঙ্গে মিললে তবেই সেই কবির কথা শেকড় মেলতে থাকে মনের মাটিতে—অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরার মতো।

উদ্ধৃত কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে এমন একটি বাণীর সন্ধান পাই যা আমার ভাবনার সঙ্গে মিলে যায়। জীবন তো সত্যিই খুব জটিল। স্বপ্নের ঘরটি কারই বা গড়া হয় এই জীবনে। তবু জীবনের গভীরে আছে কী এক দুর্দান্ত মোহিনী মায়া— সাংসারিক জটিলতার হিসেবনিকেশ প্রায় সব মানুষকেই একরকম ভুলিয়েই ছাড়ে। জীবনের ভারের দিকটা পুরোপুরি বুঝলে তো মানুষকে এক গাছা দড়ি হাতে নিয়ে চাঁদ ডুবে যাওয়া অন্ধকারে জীবনানন্দের সেই অশ্বত্থ গাছটির দিকেই চলে যেতে হয়। অধিকাংশ মানুষই তা যায় না। জীবনের ভাঁড়ার তারা শূন্য করে—কেবল জৈব অর্থেই নয়, শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ-এর টানেও জীবনের 'নিভৃত কুহক'-এ মগ্ন হয়ে যায় তারা।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আমি এই সর্বব্যাপ্ত, সর্বতোমুখ জীবনের একটা স্পর্শ পেয়ে যাই। সেজন্যই যারা বলেন—তাঁর কবিতার কল্পনার বিস্তারই সর্বাধিক, রোমান্টিক তিনি, এমনকী এমনও বলা যায় যে তিনি একজন শিশুর মতো সরল স্বতোৎসারী প্রেরণা থেকে লেখেন কবিতা—তখন তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারি না ভেতর থেকে। কেবল মনে হয়, এমন কোন কল্পনা আছে যা বাস্তব-সংস্পর্শ-বিচ্যুত! রোমান্টিকতাও মোটেই বাস্তব-বিমুখ নয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যখন 'লিরিক্যাল ব্যালডস্'-এর ভূমিকায় নতুন যুগের কাব্যতত্ত্ব নির্দেশ করতে বসলেন তখন তিনি নব্য-ধ্রুপদী কবিতার গাম্ভীর্য মননশীলতা, আভিজাত্য আর অত্যন্ত পরিপাটি কাব্য প্রকরণের পরিবর্তে সরল ও গ্রামীণ মানুষের অ-মসৃণ অকৃত্রিমতাকেই কাব্য-প্রসঙ্গ করে তুলতে চেয়েছিলেন। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের গদ্য ভাষাকেই নির্দেশ করেছিলেন যথার্থ কাব্যভাষা বলে। রোমান্টিক কবিরা বাস্তবতার সংস্পর্শজাত কিছু উপলব্ধিকে বড়ো করে তুললেন, তাঁদের রচনায় বাস্তব-সংস্পর্শের একটি বিশেষ ধরন উদ্ভাসিত হল—এটুকুই বলা যায় কেবল। শিশুর মতো প্রেরণা থেকে কবিতা লিখবেন একজন প্রাপ্তবয়স্ক কবি? তাই কি সম্ভব কখনো? কবিতা সৃষ্টির উৎসমুখে কোনো এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা সার্থক কবিদের থাকেই—কিন্তু সে প্রেরণার মূলে শিশুর সারল্য কখনোই থাকে না, থাকে জীবনকে পরতে পরতে জানার সংবেদনা। এই সংবেদনায় আনন্দ-আবেশের ভাগ যতটা—যন্ত্রণার রক্তক্ষরণও ততটাই। এই সর্বায়ত জীবনানুভবই পাই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়। যে-কারণে অনেকের চেয়ে অনেক বেশি করে তিনি পাঠক সাধারণকে কাছে টানেন।

অশ্রুকুমার সিকদার শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখেছেন—'যে আধুনিকতায় জগৎ ও জীবন বিষয়ে আনন্দ, আগ্রহ, শ্রদ্ধা, বিস্ময় এমনকি কৌতূহল পর্যন্ত বিলুপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় তার জায়গা জুড়েছে বোরডম বিরক্তি, বিতৃষ্ণা তা শক্তির কবিতায় নেই।' (প্রতিক্ষণ, ১৭ জানুয়ারি, ১৯৮৪)। খুবই অভ্রান্ত এই উক্তি। তার কারণ—তাঁর মধ্যে ছিল সেই যাদুকরের ভর যে 'জীবন নামক জটিলতার হিসেবনিকেশ'কে কাটিয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু অনেক সময়েই পাঠক এই মুগ্ধ দৃষ্টি ইন্দ্রজাল-মায়ায় একটু ভেসে গিয়ে স্থির করে নেন যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় সেই দিকটির অভাব—যাকে আমরা সোজা ভাষায় বলি 'সমাজচেতনা'। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার অন্যতম অনুরাগী ও অতি সতর্ক এক গবেষক সমীর সেনগুপ্ত—যিনি সম্পাদনা করেছেন 'অগ্রস্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়'—কবির ছড়িয়ে থাকা কবিতাবলীর এক চমৎকার সংকলন (প্রতিক্ষণ, ১৯৯০) তাঁর অভিমত একটু উদ্ধার করা যাক—'প্রথাসিদ্ধ সমালোচক শক্তির কবিতায় সহজেই কয়েকটি দোষ আবিষ্কার করবেন—সাম্প্রতিকতার অভাব, স্পর্শসহ বক্তব্যের অভাব, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের (অথবা তার অভাবজনিত যন্ত্রণাবোধের) অভাব।...তাঁর কবিতা পাঠককে কোনো সামাজিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে না, মুক্তি দেয় না কোনো সমষ্টিগত আবেগকে। মানুষে-মানুষে সম্পর্কের মহত্ত্ব বিষয়ে তাঁর কাছে আমাদের শিক্ষণীয় কিছু নেই।' (ভূমিকা, 'অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়' প্রতিক্ষণ, ১৯৯০, পৃ ১৫) লেখক যখন এইসব মন্তব্যকে 'প্রথাসিদ্ধ সমালোচক'-এর ধারণা হিসেবে উদ্ধার করেন তখন মনে হতে পারে তিনি নিজে এই ধারণা থেকে মুক্ত। কিন্তু ওই পৃষ্ঠাতেই তাঁর নিজের কথা হল—'দেশকাল, বক্তব্য, মূল্যবোধ—এইসব স্পর্শসহ বিষয়ে বর্জিত হওয়াতে শক্তির কবিতার কান্তি বড়ো আশুক্লান্ত, বড়ো বেশি কমনীয়, প্রায় স্পর্শের অতীত হয়ে ওঠে কখনো-কখনো—যা বিশেষভাবে তাঁর যুগের, অবক্ষয়িত সৌন্দর্যের চরিত্রলক্ষণ।' (পূর্বোক্ত ভূমিকা, পৃ ১৫)।—সমীর সেনগুপ্ত 'তাঁর যুগের অবক্ষয়িত সৌন্দর্যের চরিত্রলক্ষণ' বলতে ঠিক কী বুঝিয়েছেন তাতে কিছু সংশয় থেকে যায়। 'তাঁর যুগ' মানে কি ১৯৫৫ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত চার দশক—যতদিন ধরে শক্তি লিখেছেন? অথবা কেবলই পঞ্চাশের দশক? যে-দশকে প্রথম লিখতে শুরু করা কবিদের সম্পর্কে 'অবক্ষয়' শব্দটির বহুল প্রয়োগ করে থাকেন একালের 'উত্তর-আধুনিক' কবিগোষ্ঠীর কেউ কেউ। 'অবক্ষয়িত সৌন্দর্য' মানেই বা কী? যে সৌন্দর্য ক্ষয়িত হয়ে গেছে? অথবা যে সৌন্দর্যের ওপর-রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে অ-সুন্দর কীট?

সে যা-ই হোক—আমরা এখানে প্রধানত আপত্তি তুলব এই অভিযোগটির বিরুদ্ধে যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা দেশকাল, বক্তব্য, মূল্যবোধ ইত্যাদি বর্জিত। একজন কবির রচনায় তাঁর আত্মমগ্ন চিত্তলীন উপলব্ধিসমূহ প্রধানত অনুভূত হয় বলেই ধরে নেওয়া যায় না যে সমকালীন সমাজের তাপ-শৈত্য তাঁকে স্পর্শ করে না। বরং বিপরীতই সত্য—কবিমানস অনেকখানি গড়ে ওঠে সমকালীন অভিজ্ঞতার ভিতের উপর। কিন্তু কোন্ ভাষায় নিজেকে তিনি প্রকাশ করবেন—কোন অনুভূতিলোকে ঘটবে তাঁর স্বচ্ছন্দতম লেখনীচারণা—তা নির্ভর করে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিস্বভাবের ওপর। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২০) আর অরুণকুমার সরকার (১৯২১) কাছাকাছি সময়ে জন্মেছিলেন বলে একই সুরে কবিতা লিখবেন—এমন প্রত্যাশা করা কখনই সমুচিত হয় না।

তবুও বলতে চাই—সেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়—যিনি জীবনরসে ও মৃত্যুরসে যুগপৎ নিষিক্ত করে রেখেছিলেন নিজের কবিতাকে—মাঝে মাঝেই যাঁকে মনে হয় প্রাণের ভুবনডাঙায়—দুই পায়ে সুখ-দুঃখ মাড়িয়ে জীবন-তত্ত্বের বাউল-গান গেয়ে বেড়ানো এক কবি—তিনি যে অত্যন্ত অভ্রান্তভাবে আজকের যুগেরই এক কবি—একেবারে প্রথাসিদ্ধভাবেই 'সমাজ সচেতন' তার প্রত্যক্ষ নিদর্শনই পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। অধিকাংশ কবিতায় সে চেতনা প্রচ্ছন্ন কিছু কবিতায় প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষতার দৃষ্টান্তগুলিই একটু দেখব।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা-গ্রন্থের নাম—'ভাত নেই পাথর রয়েছে'। ভারতের মতো দেশে খাদ্যশস্য-উৎপাদনের স্বয়ম্ভরতার খবর পাওয়া যায় সরকারের প্রচার-মাধ্যম থেকে। কিন্তু বাস্তবে ভাত-না-পাওয়া মানুষদের দেখি প্রতিনিয়ত সর্বত্র। সেই অন্নহীনতার ক্ষোভ-ক্রোধ-যন্ত্রণা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কত কবিতার কেন্দ্রীয় উপলব্ধি তার খবর কি আমরা রাখি? 'সাম্প্রতিকী ১৯৬৩' (ঈশ্বর থাকেন জলে) নামে যে কবিতা লিখেছেন কবি তার প্রসঙ্গ খাদ্য-আন্দোলন সুর বিদ্রূপের। নিরন্ন মানুষ অন্ন চেয়েছে—ভ্রূ কুঞ্চিত করে তাকিয়েছে প্রশাসন। কবিতার ভাষায় দর্পণে উঠে এসেছে দেশ-শাসকের মুখ—'*সমস্তটাই প্ররোচনা, সমস্তটাই ফন্দি/বাইরে শুধু ভিড় বাড়াবে, ভিতরে তাই বন্দি/বস্তা বস্তা কাঁকর দিলুম উদর রইলো আস্ত/হাত বাড়ালে টিকনো দায় স্বাধীন তার স্বাস্থ্য*'।

প্রায় সবটাই উদ্ধৃত করতে ইচ্ছে করে। আরো একটি কবিতা। সেখানে আছে ভাঙা ঘরে ভাত রান্না হবার একটি ছবি। ছবি কথা বলে। শোনায় বহু দুঃখের পথ পার হয়ে পেটে এক মুঠো ভাত পড়বার গল্প—*টালিখোলার ওপরে পড়েছে রোদ, অনেকদিন/পরে, আমাদের ঘরে ভাত ফোটানো হচ্ছে/দুটো ইঁট পেতে—যেন বনভোজন খেলাচ্ছল—কালো তিজেলে ফুটেছে ভাত/জোর বরাত, আমাদের ঘরে রোদ্দুর এসেছে/ভাতের গন্ধে পেটে ভোঁচকানি লাগে, রাগে/গা জ্বলছে, পেট জ্বলছে খাণ্ডব...এই তো/ভাত নেমেছে, কলাপাতা পুড়ে হচ্ছে কালো— /ভালোই, অনেকদিন বাদে ভালো—আসছে/তাকে ডাকি।' (তোকে ডাকি, জ্বলন্ত রুমাল)*

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'ছিন্ন বিচ্ছিন্ন' নামের টুকরো কবিতার সংকলনটি একটু যেন অবহেলিত। পাঠকের মুখে মুখে তাঁর যে-সব কবিতা-পঙ্‌ক্তি ফিরতে থাকে তার মধ্যে স্থান পায় না এই রচনাগুলি। কিন্তু এই সংকলনের অনেক কবিতাতেই কবির সমাজ বিক্ষুব্ধ মনের প্রতিবাদ লেখা হয়ে আছে। অন্নহীন জীবনের রূপরেখা দেখি একটি রচনা '*কার্ণিশে বেড়াল কাঁদে, মাঝে মাঝে কান্না শোনা যায়/ কখনো গভীররাতে হিমঘুমে কাক কেঁদে ওঠে/কী যেন না পেয়ে এই ছন্নছাড়া গলির ভিতরে/মানুষ সতর্ক হয়ে, অন্ধকারে ফোঁপায় সর্বদা/আগুন যথেষ্ট আছে/কাঠ*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে/কর্তব্য রয়েছে/একমুঠি ভাত নেই, ভাতের গন্ধও নেই কোনো'। (২৯ সংখ্যক)

শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিজীবনের সূচনা-পর্বে ব্যঞ্জনা-সমুজ্জ্বল তৎসম শব্দ প্রয়োগে পাঠককে মুগ্ধ করেছিলেন। 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'-তে তিনি লিখেছিলেন—'*দহনভার ভস্মভার মরীচিভার মালা?*' কিংবা ওই কবিতাতেই '*তারাভিলাষী মাতাল শূক ফেনাবগাঢ় রাতে*' (ভ্রান্তি) 'সুবর্ণরেখার জন্ম' কবিতায় লিখেছিলেন—'*নিরুৎসুক শূন্যতার বোধি, অলস রোদ্দুরের দীপন প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র ক্রোধের আয়ুধ আমায় বিদ্ধ করে*'—সেই শক্তি চট্টোপাধ্যায় পরে একেবারে প্রচলিত শব্দের, প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগে কবিতা লিখেছিলেন লোকায়ত জীবনেরই টানে। ছড়ার অবয়বে অন্নহীনতার যন্ত্রণাকে মূর্ত করেছেন অনেক কবি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের তেমন একটি লেখা দেখি—'*সকাল থেকে সন্ধে অমন ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদে।/যখন রঙিন অনেকটা লোক নির্বোধ আহ্লাদে/কিসে তোমার কষ্ট জানি, কোথায় তোমার দুঃখ/না পেলে ভাত, তাকিয়ে থাকো প্রভুর অন্তরীক্ষে।/আর কেঁদোনা, আর কেঁদোনা ভাতের পচাই দোবো/আবার যদি কাঁদো তুমি তুলে আছাড় দেবো।*' (৪৭ সংখ্যক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন)

সমাজের একটি শ্রেণীর নিরুপায় দরিদ্র মানুষকে মানুষের মতো বাঁচতে দেয় না সেখানে সেই অতি দরিদ্র সমাজেও আছে অন্তর্গত আরো এক শোষণ। সমাজতত্ত্ববিদেরা জানেন, সাধারণ মানুষ আমরাও জানি—ধনী ও দরিদ্র—প্রতিটি সমাজেই প্রাপ্ত বয়স্কদের তুলনায় শিশুরা বেশি নির্যাতিত, পুরুষের তুলনায় নারীর ওপর সামাজিক পীড়ন বেশি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় সেই চেতনাও জাগ্রত। কলকাতা শহরের পথ-শিশুদের সম্পর্কে তাঁর বেদনালীন অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে সুপরিচিত 'আমি সহ্য করি' (ঈশ্বর থাকেন জলে) কবিতায়। তার আগে বলে নেওয়া যেতে পারে—যদিও খুব বেশি তেমন কবিতা লেখেননি—তবুও মনে হয় শিশুর প্রতি কবির এক নির্মলস্নিগ্ধ প্রিয়-সংবেদনা ছিল। সন্তানের মুখে একটি চুম্বন দানের অভিলাষে তিনি যে পৃথিবী ছেড়ে যেতে চাননি তা তাঁর অন্তরের কথা। সেই ভালোবাসাই শিশুর প্রতি ভালোবাসা হয়ে ঝরে পড়েছে কোনো কোনো কবিতায়। যে কবিতায় শিশুর প্রতি এই টান দেখা দিয়েছে সামাজিক চেতনা হয়ে সেই কবিতার দিকে তাকাই—'*মাঝে মাঝে মনে হয় কলকাতায় পয়ঃপ্রণালীর।/মধ্যে থেকে উঠে আসে, আজীবন যে শুয়ে রয়েছে শিশু/যার সামাজিক মাতাপিতা নয় স্তম্ভিত ক্রীড়ায়/যে বোঝে সবার মধ্যে...লক্ষ্যণীয় স্থান নেই তার/নিতে হবে ছলে-বলে, কেড়ে ও কৌশলে/রক্তে ও চোখের জলে ভেসে যাবে গাঙ্গোয়/কলকাতা...*'/(আমি সহ্য করি)

১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা লেখার শুরু। কবিতা-চর্চাকে পরিণত করে তোলবার পথে যে দিনগুলি তিনি পেরিয়ে এসেছেন সেগুলি কিন্তু বাংলার ইতিহাসের স্মরণীয় কিছু রক্ত-উত্তাল দিন। ১৯৫৯ সাল থেকে শুরু করে সমগ্র ষাটের দশক জুড়ে বহু বিক্ষোভ ও ধর্মঘট দেখেছি আমরা। দেখেছি রাজনৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলের ভাঙা-গড়া। ষাটের শেষ ও সত্তরের দশকের প্রথম অর্ধাংশ জুড়ে বাংলার তারুণ্য আলোড়িত হয়েছে শোষণহীন সমাজের স্বপ্নে, বন্দুকের নল অধিগত করবার প্রয়াসে, প্রশাসনের অত্যাচারে আর আত্মদ্বন্দ্বে। তরুণ প্রাণের সেই শোচনীয় ক্ষয়ে বিচলিত শিল্পীরা অনেকেই সেই সময়ে তেমনভাবে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শের সমর্থক না হয়েও রাজনীতি-সচেতন ও প্রতিবাদী কবিতা লিখেছেন। লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও।—*বিষণ্ণ রক্তের দাগ রেখে গেছে অন্ধকারে ফেলে/মুণ্ডহীন তরুণের উজ্জ্বল বিমূঢ় এক দেহ/খোলা ছিল গলির গৃহস্থ জানলা আর/কোষমুক্ত তরবারি ঘাতকের হিংস্র সাংঘাতিক...*

মুণ্ডহীন সেই তরুণকে নিজেরই সন্তান বলে ভেবে নিতে মুহূর্ত সময় লাগেনি কবির। তার পক্ষে দাঁড়িয়ে যে প্রশ্ন তিনি রাষ্ট্রের কাছে রেখেছিলেন তা সেই সময়ের বহু নাগরিকেরই সঙ্গত প্রশ্ন ছিল। সেই দিনের প্রধান সামাজিক প্রশ্নটিই উচ্চারিত হয়েছে তাঁর ভাষায়—*'এই বাল্যকালে ওই আমার সন্তান কী করেছে?/কোন্ অপরাধে এক প্রাণবন্ত জীবন আঁধারে?/ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, ও শুধু বিপ্লব চেয়ে দোষী।'* (রক্তের দাগ, ঈশ্বর থাকেন জলে)

কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিটি একটু বাহুল্য মনে হয়। নিহত তরুণের চিত্রটিই আমাদের কবি চিত্তের মর্মমূলে প্রবেশ করতে দেয়। শেষের পঙ্‌ক্তি দুটির জিজ্ঞাসার চিহ্নেই যথেষ্ট ব্যক্তিগত হয়েছিল তরুণটির নিরপরাধ মৃত্যু। তবু কবি আরো স্পষ্ট ভাষায় তার নির্দোষতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। এরকম প্রয়াস—এতখানি খুলে বলা কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব প্রকৃতির নয় যেন। কবিতাটির উদ্দেশ্যের সততায় কোনো সংশয় না রেখেও বলা যায় কবিতাটি এমনিতেই যথেষ্ট বক্তব্যমূলক। তারওপর শেষ পঙ্‌ক্তির অতি স্পষ্টতার কাব্যব্যঞ্জনার একটু ক্ষতিই হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে ভাববার দিক এটাই—পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গনগনে সময়ের যন্ত্রণায় কবিহৃদয় নিজের আপাত-উদাসী উচ্চারণ ভঙ্গিটি ছেড়ে সরাসরি প্রতিবাদের রাস্তায় নেমে পড়েছে এখানে। কবিতাটি সুন্দর হচ্ছে কিনা—এ ভাবনা তখন বোধহয় মনেই আসেনি তাঁর। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সত্তরের দশকে এমন অজস্র কবিতা লিখেছেন যেখানে কাব্যগুণ নগণ্য, প্রতিবাদগুণ তীব্র। এই কবিতাটিকে সামনে রেখে একটানে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নামও করতে পারছি। এই কবিতা যেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হতে পারত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সমাজ-মনস্কতার এর চেয়ে বেশি কোন প্রমাণ আর লাগবে?

উল্লেখ করব আরো একটি কবিতার অংশ। সমাজের ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর আদিবাসী অন্যগোষ্ঠীর মধ্যে আছে বহু প্রজন্ম ধরে চলে আসা এক পারস্পরিক অ-পরিচয়। অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের তথাকথিত ভদ্র শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে উৎখাত হয়ে গেছে আদিবাসীরা, প্রতারিত হয়েছে প্রায় সর্বক্ষেত্রে। আজও যেন দুটি শ্রেণীর মধ্যে বেড়া তুলে রেখেছে পরস্পরের প্রতি সংশয়। এটি সমাজতত্ত্বে একটি বহু আলোচিত বিষয়। সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে এই বিষয় ও এই বিভাজন নিয়ে শক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টোপাধ্যায় কবিতা লিখেছেন—তা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। এই কবিতাটিতেও কোনো অস্পষ্টতা নেই। বস্তুত স্পষ্টতার প্রখরতাই অনেক সময়ে গুণ হয়ে ওঠে এইসব কবিতায়—'*কালো যুবাটির দুটি চোখ কেন তবে অমন ঘোরালো,/কেন হনু দুটিতে নিঠুর পাথরের টুকরো গেঁথে আছে/পথ চলে পিছনে তাকায়, কীসের ঘেন্নায় থুতু ফ্যালে—/'দিক' নয়, জানে হিংস্র পশু এ জঙ্গলে অবাধ অগাধ।*'/(কী যেন কী হবে, অঙ্গুরী তোর হিরণ্য জল)

আগে বলেছি, সামাজিক শোষণের মূল দায়ভাগটি গিয়ে পড়ে শিশু ও নারীদের ওপর। এই সত্যটি—সংখ্যায় অনেক না হলেও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কোনো কোনো কবিতায় উন্মোচিত। হৃদয়-স্পর্শী একটি কবিতায় ঈশ্বর-ধারণার এক চালচিত্রে কবি স্থাপন করেছেন এক নারীকে—সমাজ যাকে চিহ্নিত করেছে 'পতিতা' বলে। সামাজিক পুরুষের প্রবৃত্তির বিষ ধারণ করে আছে যে নারী তাকে কবি দুঃখিনী করেই এঁকেছেন কিন্তু সে তার পাপ-স্বীকৃতি অর্পণ করে না ঈশ্বরের কাছে—তবু ঈশ্বর যেন তাঁর করুণা ঢেলে দিয়েছেন সেই নারীর পরেই। এমনিই দেখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবি-কল্পনায়—'*সামান্য হয়/তাঁর পুজাতে নষ্ট সময়/এবং তিনি/আমার চেয়ে ভালোবাসেন তরঙ্গিণীর/দুহাত ফাঁকা, রক্তে মাখা ওষ্ঠ, করুণ—/চায় না ক্ষমা তরঙ্গিণী পাপের দরুণ।*' (মন্দিরে, ঐ নীল চূড়া//হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান)

এর পরে আমরা উদ্ধার করব একটি সম্পূর্ণ কবিতা। কারণ প্রথমত, এই কবিতাটি তাঁর সম্পর্কে আলোচনাকালে বিশেষ গৃহীত হতে শুনিনি। দ্বিতীয়ত, অংশ উদ্ধারে কবিতাটিকে ঠিক হৃদয়ে নেওয়া যাবে না মনে হয়। তৃতীয়ত, কবিতাটি খুব বড় নয়। চতুর্থত, এবং সেটাই প্রধান কারণ—এক দরিদ্র ও নিঃসহায় নারীকে তিনি কবিতাটির সম্পূর্ণ অবয়বে মূর্ত করেছেন। কবিতাটি ভাঙলে সেই নারীও ভেঙে যায়। আগে কবিতাটি দেখি—

'*ধুলোতে ওই ঘুর্ণী, ঘোরে, সুদর্শন পোকা*
দূরের চিঠি কাছে আনাও সুদর্শন পোকা
শুভ খবর কাছে আনাও, দাবার চালে দোলা বানাও
হা পিত্যেশ নোলা বানাও সুদর্শন পোকা
আঙুল চেলে গণ্ডি করি সুদর্শন পোকা
নিখাকি হাতে গড় করেছি সুদর্শন পোকা
ধূলোর ঘর ভাঙো তুখোড় সুদর্শন পোকা।
বেরিয়ে এসো, মন্দ বেশে—সুদর্শন পোকা
তামাভরণ যেটুকু ছিলো স্যাকরাবাড়ি গ্যালো
চার খেজুর গাছের রস মোল্লাবাড়ি পোলা
পরার কানি হাতের পানি মড়ার কাঠ কই?
ছেলেপুলের বুক না তো ও, ডোঙার ওপর-ছই
লোকটা আছে, না ফুঁকে গ্যাছে—দিও না মোকে ধোঁকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ না দিলি, কাল ক'রো না সুদর্শন পোকা।'

(সুদর্শন পোকা/যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো।)

কাব্যবাণী উচ্চারিত হতে পারে পুরুষের ভাষায় অথবা নারীর, রবীন্দ্রনাথ নারীর ব্যক্তিত্ব-আড়ালে অনেক কবিতা লিখেছেন। এ ব্যাপারে একটা বিশেষ পটুত্বই ছিল তাঁর। শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা রবীন্দ্রোত্তর কোনো কবিকেই আমরা এই রীতি গ্রহণ করতে দেখি না তেমন। ক্বচিৎ যে দু-একটি কবিতায় আছে পুরুষ কবির কলমে নারীর হৃদয়ের বাণী—তার মধ্যে এই কবিতাটির স্থান অনন্য। নিঃসহায় নারীর ভাষা এমনভাবে উচ্চারণ করবার ক্ষমতা কবির কল্পনাশক্তি ও করুণ-কুশলতার অন্যতম নিদর্শন!

সুদর্শন একজাতের পোকা। গাছগাছালির মধ্যে থাকে। পাখার ওপর সাদা ও লাল চন্দনের ছিটের মতো দাগ। পোকাটি মাটিতে পড়লে গোল হয়ে ঘোরে—বৃত্তাকার দাগ পড়ে যায় ধুলোর ওপর। গ্রামদেশের মেয়েদের বিশ্বাস—এই পোকা সৌভাগ্য-সংবাদ বহন করে আনে। তাই এই পোকা দেখলে গ্রামের মেয়েরা সৌভাগ্য প্রার্থনা করে পোকাটির কাছে। 'পথের পাঁচালী'-র কিশোরী দুর্গা সুদর্শন পোকা দেখে বলেছিল—'সুভালাভালি রেখো-সুদর্শন, সুভালাভালি, রেখো...— অপুকে ভালো রেখো, মা কে ভালো রেখো, বাবাকে ভালো রেখো, পাড়ার খুড়ীমাকে ভালো রেখো...নীরেনবাবুকে ভালো রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন, রাণুর দিদির মত বাজি-বাজনা হয়।'

এই কবিতার ভাষা যে-নারীর মুখে কবি বসিয়েছেন সে দুর্গার চেয়ে বড়ো। বিয়ে হয়েছে তার কিন্তু স্বামীর সন্ধান নেই। তাই সে স্বামীর খবর চায় সুদর্শন পোকার কাছে—'*লোকটা আছে, না ফুঁকে গ্যাছে—দিওনা মোকে ধোঁকা*'। এই নারীর সব সম্বল একে একে নিঃশেষিত—তামাভরণ গেছে স্যাকরার ঘরে আর খেঁজুরগাছ মোল্লাবাড়িতে। অন্নহীন সেই নারী সুদর্শন পোকার কাছে শুভ খবর চায়—'*নিখাকি হাতে গড় করেছি সুদর্শন পোকা*'! দুর্গা বোধ হয় তার আশাটুকু নিয়ে মরেছিল। কিন্তু অনেক বেশি পোড় খাওয়া এই মেয়ের বুক ফেটে বেরিয়ে আসে অন্তিম প্রশ্ন—'*পরার কানি হাতের পানি, মড়ার কাঠ কই?*' এই কবিতার কবি সমাজের দিকে চেয়ে দেখেননি—একথা বলার সুযোগ এর পর আমাদের আর থাকে না।

যেমন মৃত্যুর কথা বারবার ঘুরে আসে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়, তেমনি আসে ঈশ্বরের কথাও। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে নিশিকান্ত বা পরমানন্দের মতো ভক্তিযোগের পথে সংসার ত্যাগ করা সাধক কবিদের বাদ দিলে বোধহয় তাঁর কবিতাতেই ঐশী শক্তির কাছে আনতশির হবার উপলব্ধি সবচেয়ে বেশি করে আমাদের ছুঁয়ে যায়। কিন্তু ঐশীবোধ আর ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিকতা এক নয়—একথা শক্তি চট্টোপাধ্যায় ভোলেননি কখনো। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম থেকেই ভেদবুদ্ধি দেখা দেয়—এই গূঢ় সামাজিক চেতনা সর্বদা সতর্ক থেকেছে তাঁর মনে। তাই তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতেও পেরেছেন—'*মন্দিরের থেকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার আজ/বেরিয়ে পড়েছে পথে, ইঁদুর ছুঁচোর মতো পথে।*' (মন্দিরের থেকে বহু শতাব্দীর অন্ধকার/যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো) সর্বোপরি আছে বিশ্বজোড়া কুটনীতির খেলা। মানুষের রাজনীতি-চেতনার সঙ্গে সভ্যতার একটি কল্যাণ- আদর্শের স্বপ্ন জড়ানো থাকবে—এমন অসম্ভব আশা এখন বোধহয় কেউই করেন না। সর্বস্তরেই ক্ষমতার দখল নেবার জন্য পরিকল্পিত পদক্ষেপের নামই আজ রাজনীতি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট হবে— '*এইভাবে/পৃথিবীর কিছু সত্যিকার ক্লেদ ধুয়ে মুছে যাবে/ভুল হবে বুদ্ধশ্বাস তৃষ্ণা হবে পাথরে সংযমী/আর ছাড় রাজনীতি! বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করবে ভোট/ এইভাবে.../পৃথিবীর কিছু সত্যিকার ক্লেদ ধুয়ে মুছে যাবে—/যেভাবে প্রতিমা ধোয়, সেভাবেও ধোবে একদিন/বের হয়ে পড়বে খড়, কাঁচা বাঁশ—সাধ্য ও দালালি।*'/ (প্রতিক্রিয়াশীল অস্ত্রের গৌরবহীন একা)।

কবিতার শিরোনামেও আত্মবিদ্রুপের আবরণে কবি রাজনৈতিক খণ্ডদৃষ্টির দিকটিকে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন।

আরো একটি পরিহাস জড়ানো কবিতায় কবি এই সমাজে দ্রুতবেগে পরিব্যাপ্ত হয়ে যাওয়া বাণিজ্যিক মানসিকতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। বিশেষ বিশেষ সময়ে ছাড় দেবার প্রলোভন এখানে কবিতার প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়িত। তিনি বলেছেন কবিতা নিয়ে এখনও এই ছাড়ের খেলা শুরু হয়নি। কিন্তু হবে অচিরেই—'*তবে হবে, পরে হবে, সব কিছু যখন ছাড়ের/আওতায় এসেছে, একে সবিশেষ ছাড় দিতে হবে।/অনন্য থাকবে না, শুধু রীতিনীতি কিছুটা আলাদা/করতে হবে, সে ব্যাপারে প্রকাশক-কবির বৈঠক/কিংবা শীর্ষসম্মেলন, পার্বত্য শহরে ডাকতে হবে/হবেই ছাড়ের ফাঁসে অভ্যেস হয়েছে।*' (সবিশেষ ছাড়/যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো)।

কবিতাটির উপস্থাপনায় প্রমাণ রয়েছে বর্তমান সমাজ-রাজনীতির ধ্যানধারণা সম্পর্কে কবির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের।

উদ্ধার করব আরো একটি ছোটো কবিতার পঙ্‌ক্তি। অজস্র না হলেও ভারতীয় পুরাণ-ইতিহাস-প্রাচীন সাহিত্যের উপাদান শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় ব্যবহৃত হয়। এইসব প্রযুক্তির সাহায্যে সাধারণতই গড়ে ওঠে কবি মানসের নিমগ্নতার রূপ। কিন্তু কখনো কখনো একালের সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্লিষ্ট, ভঙ্গুর, অকল্যাণবোধ লাঞ্ছিত চেহারাও কবি বার করে এনেছেন প্রাচীন উপাদানের পাথরকে ভেঙে এবং গড়ে। 'শাক্য' (যেতে পারি কিন্তু কেন যাবো) কবিতায় সেই উপাদান হয়েছে কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থ আর তার কোলে এসে পড়া তীরবিদ্ধ মরাল। কবি প্রত্যক্ষত বলেছেন এক একালের তরুণের কথা যার কোলে এসে পড়েছে এক আহত কপোত। কিন্তু সেই পাখিটিকে বাঁচাবার জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দেয়নি এই কালের ছেলেটি—'*কপিলাবস্তু ছাড়লো না এই নতুন রাজার ছেলে/শাক্য হয়ে*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রইলো এবং গোলা পায়রার ছানা/বেড়াল মুখে কামড়ে নিয়ে চললো অন্ধকারে...'

এখন প্রশ্ন এই, সমকালের সমাজ ও সমাজনীতি সম্পর্কে যখন আমরা দেখছি, যথেষ্টই সচেতন ছিলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়—তাহলে কেন আজও তাঁর সম্পর্কে কোনো কোনো পাঠকও ভাবেন যে, সামাজিক মূল্যবোধের দিকটি খুব জোরালো নয় তাঁর কবিতায়।

মনে হয় কারণ নিহিত আছে—কবির বহু সংখ্যক মন উদাস করা কবিতায়। মৃত্যু, নিসর্গ ঈষৎ রহস্য ব্যঞ্জনাময় কবি-কল্পনা, আপাত নিরাসক্ত এক পথিক-দ্রষ্টার মনোভঙ্গি তাঁর কবিতায় বারবার আসে। পাঠক প্রধানত অভ্যস্ত হয়ে যান সেই অন্তর্গহন মনের সুরটির পুনরাবর্তনে। অন্য ধরনের কবিতার দিকে সহজে পাঠকের চোখ পড়ে না। দ্বিতীয় একটি গুরুতর কারণ হল কবির নিজেরই কোনো কোনো উক্তি, যেখানে কবি পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতনতার কথা কিছুটা অস্বীকারই করেন। এখানে উদ্ধার করছি ১৯৬২ সালে লিখিত কবির কয়েকটি ছত্র—'কবিতার কোনো বাস্তবিক উদ্দেশ্য নাই। কবিতা কবিগণের কাছে এক-প্রকারের নিভৃত ও নির্জন যৌনাচার। কবিতা ঘোরতর অসামাজিক। অবশিষ্ট সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমাজসেবা।' (পূর্বোক্ত 'অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ে' সংকলনে মুদ্রিত)। কিন্তু রচনাটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত তার কোনো উল্লেখ নেই। ১৯৬৮ সালে, আরো একটু পরিণত কবি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন—'কবিতা রচনাকালে আমি যেন স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে পালিয়ে থাকি।' (অন্বীক্ষণ, দশম সংকলন, ১৩৭৫) আরো পরে ১৯৭৩-এ নিজের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায় তিনি লেখেন—'আমার নিজের কাছে, একাকীর কাছে, কবিতা অবলম্বন। নিজেকে নিজের মতো করে দেখার চমৎকার জলজ দর্পণ এক।'—কবি যে নিজের কবিতাকে সমাজসচেতনার দিক থেকে দেখতে চান না—সেই ইচ্ছাই যেন ফুটে ওঠে এসব কথায়। ফলে পাঠকও সেরকমই ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু লেখাকে আমরা কি গ্রহণ করব সর্বত্র লেখকেরই ব্যাখ্যা অনুসারে? না কি তাঁর রচনার নিরিখে? লেখক যা বলবেন তা-ই সর্বদা সত্য হবে এমন মনে করবার কারণ নেই। ১৯৬২-তে লিখিত পূর্বোক্ত রচনাটিতে শক্তি বলেছেন—'পদ্য যাঁরা লেখেন তাঁরা কখনও সত্য কথা বলেন না।'—এই বাক্যও তাহলে সত্য বলে মানতে হয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় সহ পঞ্চাশের কোনো কোনো কবি প্রথম দিকে চমক দেওয়া কথাবার্তা বলতে বেশ ভালোবাসতেন। অসতর্ক থাকা বাক্য উচ্চারণে কোনো দ্বিধাই ছিল না তাঁদের। সবসময়ে যে নিজের প্রতিটি বাক্য নিয়ন্ত্রণ করবার মতো অবস্থায় থাকতেন—তা-ও নয়। কাজেই কোথায় কী বলেছেন—বিশেষত ১৯৬২ সালে যখন বয়স সদ্য ত্রিশ—তখনকার কোনো কথাকে কবির সমগ্র রচনার পরিচয় বলে ধরে নেওয়া সুস্থির পাঠকের পক্ষে অনুচিত। কবিকে জানতে হবে তাঁর কবিতা থেকে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আমাদের বলে দেয় যে—কবিতা যদি তাঁর 'জলজ দর্পণ' হয় তাহলে সেই জলতল পার্থিব কন্টকগুল্মে আকীর্ণ। আর, আকাশ ও পৃথিবীর যে প্রতিবিম্ব সেখানে জাগে সেই আকাশে ধুলির ঝড় আছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর আছে সংঘাত ক্লিষ্ট এক মানব-সমাজ।

সেই মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনেক কবিতা উৎসারিত। 'মানুষে মানুষে সম্পর্কের মহত্ত্ব বিষয়ে তাঁর কাছে আমাদের শিক্ষণীয় কিছু নেই।'—একথা যিনিই বলুন—একথা সত্য নয়। যখন কবি মানুষের সমাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার কথাও বলেছেন তখনও আমাদের ছুঁয়ে দেখতে হবে সেই ক্ষুব্ধ উচ্চারণের আড়ালে নিহিত বেদনার স্তরগুলি—যে বেদনারও জন্ম মানুষের প্রতি প্রেম থেকেই। অনেক কবিতাই আছে। একটিমাত্র কবিতার উল্লেখে এ-লেখা শেষ করি—

'পাহাড়ের চূড়া থেকে আমার নিঃশ্বাস ঠেলে
ক্রমাগত অন্ধকার পড়ে
দূরে কাছে জনপদ, সিংহাসন জেগে ওঠে
মানুষের হৃদয়ের কাছে...
মানুষ অনেক অন্ধ, অনেকের অন্ধতা গিয়েছে/
বুঝেছি যাবার নয় আমার চোখের ভিক্ষা চাপ...
যদি কৃপা করো, যাই, সন্তানের মুখ দেখে আসি'

(অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে/প্রভু নষ্ট হয়ে যাই)

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~